দখিন হাওয়া
রুপসী সেই নগরে
জসিম মল্লিক

১.
বছরের শুরুতেই মন পালাই পালাই করে উঠে। বিদেশের একঘেয়ে ও বৈচিত্র্যহীন জীবন থেকে কয়েকটা দিনের জন্য হলেও মুক্তি। প্রবাস জীবনের পাঁচ বছর প্রায় পূর্ণ হলেও এখনও মন পড়ে থাকে অন্য কোথাও অন্য কোনো খানে। তার উপর রয়েছে এ দেশের প্রলম্বিত ঠান্ডা ও বরফের অত্যাচার। বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও আমি এত আনন্দ আর বৈচিত্র্য খুঁজে পাই না। দেশের মাটি ছেড়ে আসার শোধ নিচ্ছে বোধহয় প্রকৃতি। বিদেশে এসে অনেক কিছু হারিয়েছি যা আর এক জীবনে ফিরে পাবোনা। অনেক বিস্ময়কর সব ব্যাপারের সাথে পরিচিত হয়েছি যা এক জীবনে আর ঘটবে না। এখানে প্রায়শঃই যা করতে চাইনা তাই করতে হয়। যা শুনতে চাই না তাই শুনতে হয়। এই জীবন থেকে মুক্তির দিন গুনি শুধু। কবে মিলবে মুক্তি? মিলবে কি?
জীবনের কঠিন যাঁতাকল থেকে মুক্তি পাওয়া সত্যি কঠিন। সবাই মুক্তি খোঁজে কিন্তু পায় কি? একটা জীবন চলে যায় মুক্তির প্রত্যাশায়। প্রতিনিয়ত একটা না একটা বাধা এসে সামনে দাঁড়ায় মুক্তির পথে। শেষ পর্যন্ত আর মুক্তি পাওয়া যায় না।
সকাল নটায় ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের বোয়িং ৭৭৭ এ হিথ্রো পৌঁছে যায়। বাইওে বেরিয়ে দেখি বিখ্যাত লেখক সাংবাদিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বন্ধু আসিফ নজরুল ঘুম ঘুম চোখে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে কফির কাপ। আমার প্ল্যান হচ্ছে কয়েকটা দিন ইউরোপে কাটিয়ে দেশে যাওয়া।
আসিফকে জড়িয়ে ধরে বললাম, দোস্ত কেমন আছ!
আসলে আসিফ এয়ারপোর্ট আসুক এটা আমি চাইনি। কারণ আমি জানি সে খুব ব্যস্ত এখানে। সে এসেছে কয়েকমাসের জন্য একটা বিশেষ কোর্সে। অবশ্য সে পিএইচডি করেছে লন্ডন থেকেই। আমি হোটেলে থাকা একদম পছন্দ করি না। একাকী হোটেলবাস হচ্ছে নির্বাসনের মতো। কষ্টকর। আমি মানুষের মধ্যে থাকতে পছন্দ করি। আমার কিছু আত্মীয় স্বজন আছে বটে লন্ডনে কিন্তু তারা খুব একটা অতিথিপরায়ন নয়। তবে রত্না খালা ব্যতিক্রম। রত্না খালা আমার সম বয়সী। আমরা বন্ধুর মতো। লন্ডনে সে দুইটা বাড়ির গর্বিত মালিক। সে অন্ততঃ দশবার ফোন করেছে আমি যেনো অবশ্যই তার ওখানে উঠি। কিন্ত আমি শেষ পর্যন্ত আসিফের কাছে থাকাই সব্যস্ত করলাম। কারণ রত্না খালা বিশেষ প্রয়োজনে দেশে গেছে কিন্তু সে আমার থাকার ব্যবস্থা করে গেছে তার বন্ধু কুলসুম খালার বাড়িতে। তবে সে আমি থাকতেই এসে পড়বে। সে এসেছিল। এবং আমার জন্যই এসেছিল। শেষের দুদিন তার ওখানে ছিলাম।
২.

আমরা একটা ট্যাক্সি নিয়ে কুলসুম খালার বাড়িতে আমার ঢাউস লাগেজগুলো রেখে টিউবে করে চলে এলাম আসিফের সেন্ট্রাল লন্ডনের বাসায়। কুলসুম খালার বাসা ইষ্ট হন্সলো। এয়ারপোর্ট থেকে দশ মিনিটের ড্রাইভ। রত্না খালার বাসাও একই জায়গায়।
এর আগে লন্ডন এসেছিলাম ২০০০ সালে। লন্ডন আসলে আমার প্রিয় জায়গা নয়। এখানকার কিছু ঐতিহ্যবাহী স্থান ছাড়া অন্যকিছু আমাকে তেমন আকৃষ্ট করতে পারে নি। তবে যারা দীর্ঘদিন ধরে াকে এই দেশে তাদের কাছে খুউব প্রিয় লন্ডন। টরন্টোর তুলনায় লন্ডনের জীবন অনেক কঠিন বলে মনে হয়েছে। মানুষজন একটু বেশী যান্ত্রিক। হিসেবি। বাঙ্গালিরা আরও বেশী। তবে কিছু অসাধারণ মানুষ আছে এ শহরে। যাদের দেখা আগেও পেয়েছি। সুরমা পারের মানুষ শিরোনামে একবার লিখেছিলাম তাদের কাথা।
১৩ ও ১৪ জানুয়ারী লন্ডন অবস্থান করে পরদিন সকালে চলে গেলাম প্যারিস। এটা আমার পূর্বনির্ধারিত প্রোগ্রাম। আগেই উইরোস্টারের টিকেট পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। এই দু'দিন আমি আর আসিফ লন্ডন শহর চষে বেড়ালাম। আমরা আবার অনেকদিন পর সুখ দুখের আলাপ করার সুযোগ পেলাম। আশির দশকে আমরা যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি বা তার পরে বিচিত্রার যুগে আমরা একসাথে কাজ করেছি। আমাদের অনেক স্মৃতি আছে। আসিফ বিখ্যাত অভিনেতা রোকেয়া প্রাচীকে বিয়ে করে এখন চমৎকার জীবন যাপন করছে। ওর শিশু কন্যার জন্য সরাক্ষন মন খারাপ করে। কখন যাবে স্ত্রী কন্যার কাছে কাছে এই চিন্তা সারাক্ষন। মাঝখানে একবার ঘুরেও এসেছে। আমরা লন্ডনের উল্লেখযোগ্য স্থানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখলাম।
একদিন আমরা গেলাম ব্রিকলেনে একটি অনুষ্ঠানে। সেখানে আমার অতি প্রিয় বিচিত্রার শামীম আজাদের সাথে দেখা হলো। শামীম আপা এখন লন্ডনের মেইনস্ট্রিমে লেখালেখি করেন। এবারের বই মেলায় তার একটি কাব্যগ্রন্থ্য প্রকাশিত হয়েছে। আমরা তিনজন দীর্ঘক্ষন আড্ডা মারলাম একটি রেস্টুরেন্টে। পুরনো অনেকের সাথেই দেখা হলো। আমার বন্ধু লিপি একদিন এসেছিল দেখা করতে। জনমত অফিস ঘুর আসা গেলো। বিবিসির মিজানুর রহমান খান লন্ডনের বসচেয়ে ব্যস্ত মানুষ। তাই আসতে পারেনি।
৩.
১৫ জানুয়ারী ২০০৮।
চমৎকার প্যারিসের সন্ধ্যা!
যাকে ভয় করছিলাম সেই বৃষ্টিকে মাথায় নিয়েই শেষ পর্যন্ত মেট্রো ট্রেন থেকে বের হতে হলো। সাথে সাথে ইলশেগুড়ির হিমেল হাওয়ার ঝাপটা মুখের উপর পরশ বুলিয়ে দিল। টানেল থেকে মাথা বের করতেই বিস্মিত হবার পালা। আহা কী ঝকঝকে শহর!
এর নাম প্যারিস!
লন্ডন থেকেই গোমরা আবহাওয়া বিরাজ করছিল। ইউরোস্টারে ইংলিশ চ্যানেলের নিচ দিয়ে যখন প্যারিসের পথে তখনও থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছিল। আসিফ তার মূল্যবান সময় নষ্ট করে

আমাকে প্যানক্রিয়াস স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছিল। এমনকি যেদিন আমি লন্ডন ফিরে আসি সেদিনও সে আমাকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসে।

প্যারিস নর্ড -এ পৌঁছালাম দুপুরের দিকে। মাত্র সোয়া দুইঘন্টার যাত্রা। স্টেশনে লেখক ও গবেষক খান আনওয়ার হোসেন, জনপ্রিয় ওয়েব ম্যাগাজিন একটি বাংলাদেশের সম্পাদক ওয়াসিম খান পলাশ, আজকেই সুইডেন থেকে আগত আমার ক্ষুদে বন্ধু নাজু এবং আনওয়ার ভাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেয়ে এরিন ও জাফর ভাই ছিল। আমি আনওয়ার ভাইয়ের আতিথ্য গ্রহন করলাম। দুপুরের খাওয়া খেয়ে আমরা দেরী না করে বেড়িয়ে পড়লাম। আমাদের তিনদিনের প্রোগ্রাম সব রেডি করা। বসে থাকার কোনো উপায় নেই।

প্যারিস নগরীতে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির সাথে আলোকমালা এক সান্ধ্য খেলায় মত্ত হয়ে প্রকৃতিকে আরো রমনীয় করে তুলেছে। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাথরের এক সুউচ্চ সুলবৎ ফলা। ফরাসী ভাষায় যাকে বলা হয় অবেলিস্ক। অবেলিস্কের গা জুড়ে লেখা প্রাচীন মিশরীয় প্রতীকলিপি। যে স্থানের কেন্দ্রস্থলে অবেলিস্কটি প্রথিত সে স্থানটিকে বলা হয় প্লাস কঁনকর্দ। ১৮৩১ সালে এ অবেলিস্কটি আধুনিক ইজিপ্টের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান মোহাম্মদ আলী ফ্রান্সকে উপহার দিয়েছিল। ২২০ টনের অবেলিস্কটি ১৮৩৬ সালের ২৫ অক্টোবর প্লাস কঁনকর্দে স্থায়ীভাবে খাড়া করে রাখা হয়। অনেক ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে অবেলিস্কটি এখনও প্যারিসের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে আছে। অবেলিস্কের একপাশে লুভ্‌র মিউজিয়ামের দিকে বিশাল আকারের আলোকসজ্জিত নাগরদোলা জাতীয় এক মেরী গো রাউন্ড। অবেলেস্কির অপরদিকে ঘন মেঘমালার পর্দা সরিয়ে দাঁড়িয়ে আইফেল টাওয়ার। তার আলোকচ্ছটাও কিছুক্ষণ পর পর প্যারিস টাউনের উপর বুলিয়ে সদা সতর্ক পাহারায় ব্যস্ত।

সে সন্ধ্যায় প্যারিসের রুপে এতোই বিভোর ছিলাম যে বৃষ্টির সহবস্থান একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। বৃষ্টির তোড়ে টিকতে না পেরে মেট্রো ট্রেন ধরে লা দিফন্স এলাকায় যাত্রা। প্যারিস শহরে মেট্রো ট্রেনের বহুরুপিতা লক্ষ্যনীয়। এখানে প্রতিটি মেট্রো লাইনের বিশেষত্ব রয়েছে এবং সহজেই একটি লাইন থেকে অন্য লাইনের মেট্রোকে আলাদা করা সম্ভব। মাঝখানে এক লাইনের মেট্রোতে চড়েছিলাম যার কোনো ড্রাইভার নেই। যাত্রী নিয়ে একাই ছুটে চলছে।

৪.

ঐতিহ্যবাহী প্যারিস শহরের একপাশে আধুনিক প্যারিসও গড়ে উঠেছে। লা দিফন্স এলাকা তার নমুনা বহন করছে। তবে এই আধুনিকতার মাঝেও এক ব্যতিক্রমধর্মী সংস্কৃতির পরশ রয়েছে। লা দিফন্স এলাকাটি বাস্তবে রুপ নেয় সাবেক ফরাসী প্রেসিডেন্ট ফ্রঁসোয়া মিতেরোঁর আমলে। এটা তার অনেকদিনের স্বপ্ন ছিল। ফরাসী সোসালিস্ট প্রেসিডেন্ট ফ্রান্সকে আধুনিক রুপ দিতে অনেক অবদান রেখেছেন এবং বিশাল বিশাল প্রজেক্ট হাতে নিয়ে বাস্তবায়ন করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে ফরাসী জাতীয় লাইব্রেরী, লুভ্‌র মিউজিয়াম বর্ধিতকরণ, মিউজিয়ামটির সামনে পিরামিড গেট প্রতিষ্ঠাকরণ, লা দিফন্স এলাকা আধুনিকিকরণ, ইমা বা আরব জাহান ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠাকরণ ইত্যাদি।

লা দিফন্সের মেট্রো থেকে বের হতেই চোখে পড়ে বিশাল এক গেট। নয়নাভিরাম গেটটির অপূর্ব নির্মাণশৈলী অবলোকন করার মতো। প্যারিস শহরের পশ্চিম দিক হতে গর্বে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে এ গেটটির নাম দিফন্সের বিশাল গেট। তিন লক্ষ টন ওজনের শরীর নিয়ে দাঁড়ানো গেটটির উচ্চতা ১১০ মিটার মাত্র। গেটটি ১৯৮৯ সনের জুলাই মাসে উদ্বোধন করা হয়। গেটটি মূলতঃ অনেকগুলি অফিসের সমন্বয়ে গঠিত এবং সে সব অফিসে মোট ৪৫০০ জন কর্মী কর্মরত। গেটটির সামনে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বসিয়ে রাখা হয়েছে অসংখ্য আধুনিক আর্টের স্কাল্পচার। বারিধারার ফাঁক দিয়ে অনেক দূরে আরেকটি অনুরুপ গেট দেখা যাচ্ছিল। জানা যায়, অনেকটা ঐ গেটটির অনুকরণে এবং ঐ গেটটির বরাবর কঁনকর্দ প্লাসকে যুক্ত করে এই লা দিফন্সের গেটটি করা হয়েছে। ঐ গেটটির নাম আর্ক দ্য ত্রিয়োম্ফ বা বিজয় গেট।

আর্ক দ্য ত্রিয়োম্ফ বা বিজয় গেটে গিয়ে আবার অবাক হলাম। আমরা যেখানে যেয়ে মেট্রো থেকে উঠলাম সেই বিশাল স্ট্রীটটির নাম শঁম্প্জ ইলিজে। দুনিয়ায় যত সুন্দর এ্যাভিনিউ আছে শঁম্প্জ ইলিজেকে তার অন্যতম সুন্দর এ্যাভিনিউ বলা হয়। যেসব পর্যটক বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন তারা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে এটা বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর এ্যাভিনিউ।

এখানে আসে তামাম দুনিয়ার চিত্রতারকারা সুটিং করতে। ক'দিন আগেও অভিষেক বচ্চনকে নাচানাচি করতে দেখা গেছে। পুরো এ্যাভিনিউ ধরে আলোকসজ্জার বহর দেখে মনে হয় মানবসৃষ্ট সৌন্দর্য ও এরচেয়ে মনমাতানো দৃশ্য পৃথিবীতে আর কী থাকতে পারে। এখানে এ রকম ১২টি সুন্দর ও প্রশস্ত এ্যাভিনিউ এসে মিলিত হয়ে কেন্দ্রস্থলে আর্ক দ্য ত্রিয়োম্ফ মথা উঁচু করে দাড়িয়ে আছে।

আর্ক দ্য ত্রিয়োম্ফ বা বিজয় গেটটি নির্মাণের প্রজেক্ট নেপোলিয়ন ১৮০৬ সনে হাতে নেন বলে জানা যায়। কিন্তু ১৮১২ সনে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে পরাজিত হবার পর এর নির্মাণ কাজ ব্যহত হয়। অবশেষে ১৮৩২ সনে আবার প্রজেক্ট বাস্তবায়নের কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়। এবং ১৮৩৬ সনে রাজা প্রথম লুই ফিলিপের আমলে গেটটির নির্মাণ কার্য শেষ হয়। আর্ক দ্য ত্রিয়োম্ফ মনুমেন্টটি ৫০ মিটার উচু ও ৪৫ মিটার চওড়া।

প্রতি বছর ১৪ জুলাই ফরাসী জাতীয় দিবসে এখান থেকে প্যারেড অতিক্রম করে। ফরাসী ম্যারাথন, ত্যুর দ্য ফ্রঁন্স বা সাইকেল রেস, অন্যান্য অনেক খেরাধুলা ও অনেক কর্মকান্ডের কেন্দ্র এই শঁম্প্জ ইলিজে। ১৯৯৮ সনে বিশ্বকাপে ফ্রান্স জিতলে 'ফ্রান্স জিন্দাবাদ' এ কথাটা ও জিনেদিন জিদানের ফটো এই আর্ক দ্য ত্রিয়োম্ফের উপর প্রথম ভেসে উঠেছিল। শঁম্প্জ ইলিজের দৃশ্যাবলীর সৌন্দর্য অনুভব করতে করতেই দিনটি পার হলো।

৫.

১৬ জানুয়ারী।

মেট্রো ও রিজিওনাল ট্রেন ধরে উইরো ডিজনিতে যাত্রা। শহর থেকে ৪০ মিনিটের রাস্তা, মার্ন লা ভালে নামক স্থানে আমেরিকান কোম্পানী বিনোদন কেন্দ্র ডিজনীল্যান্ড গড়ে তুলেছে।

১৯৯২ সানের এপ্রিল মাসে এটি উদ্বোধন করা হয়। প্রতিদিনকার নিত্যনৈমিত্তিক জনকোলাহল থেকে দূরে সাময়িক বিনোদনের জন্য স্থানটি খারাপ লাগেনা। ডিজনীল্যান্ড পার্কের পাশে ডিজনী স্টুডিও ও ডিজনী ভিলেজও রয়েছে। সেখানে এতসব বিনোদন রয়েছে যা একদিনে উপভোগ করা সম্ভব নয়। শিশুদের জন্য ডিজনী হচ্ছে আনন্দের মক্কা। শিশুদের মনমাতানো পুতুলের জগত থেকে ট্রেন, জাহাজ, পুরনো অটোমোবিলে ভ্রমণ সব ধরণের যানবাহনই উপভোগ করা গেলো। রয়েছে ফ্যান্টাসীল্যান্ড, ফ্রন্টিয়েরল্যান্ড, ডিসকোভারীল্যান্ড, এডভাঞ্চারল্যান্ড, মেইনস্ট্রিট ইত্যাদি।

১৭ জানুয়ারী।

বিশ্বখ্যাত লুভ্‌র মিউজিয়ামে যেয়ে বিস্মিত হবার পালা। একটি মিউজিয়াম যে এত সমৃদ্ধ হতে পরে তা এখানে না এলে বিশ্বাস করা কঠিন। প্রথমেই ছুটলাম সেই দুনিয়াখ্যাত লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মোনালিসার খোঁজে। যেয়ে দেখি বেশীরভাগ দর্শক সেই রহস্যময় হাসির মেয়েটির ছবিটির উপর হামলে পড়ছে। মোনালিসার উপর দৈনিক এত ফ্ল্যাশ প্রতিফলিত হয় যে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়ে তাকে রক্ষার জন্য জন্য এন্টি ফ্লাশের কাঁচের ফ্রেমে আবদ্ধ করে রেখেছে।

অবশ্য প্রফেশনাল ক্যামেরা দিয়ে তার ছবি তুলতে অসুবিধা হয় না। নয়তো ফ্লাশের আলো নিজের উপর ঠিকরে আসে। ফরাসী রাজা ফিলিপ অগাস্ট স্যান নদীর তীরে প্যারিস শহরের প্রান্তদেশে ১১৯০ সানে লুভর রাজ প্রাসাদ তৈরী করেন এবং বিভিন্ন দেশ থেকে আর্ট সামগ্রী কিনে প্রাসাদটিকে সমৃদ্ধ করেন। ১৭৯৩ সন থেকে লুভর প্রাসাদটি ধীরে ধীরে মিউজিয়ামে পরিবর্তিত হয় এবং ১৮৮২ সনে ক্ষমতাসীনগণ সম্পূর্ণভাবে বাসস্থান পরিবর্তন করলে লুভর পরিপূর্ণ একটি মিউজিয়ামে পরিণত হয়। শুধুমাত্র অর্থমন্ত্রী লুভর এর একটি অংশে অবস্থান করলে তাকে অপাংতেয় বলে মনে হতো। তবে তা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি।

অতীতের সেই রাজপ্রাসাদ আজকের এই মিউজিয়াম। এবং এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় মিউজিয়াম। এটি পুরোপুরি দেখতে কমপক্ষে সাতদিন সময় প্রয়োজন। বিশাল বিশাল ফরাসী, ইতালীয়ান পোট্রেটগুলো খুবই জীবন্ত। মিশরীয় সভ্যতার ক্রনিকাল চিত্র হয়তো আর মিশরে যাওয়ার দরকার হয় না। মনে, মানে, সেজান, রেনোয়ার প্রভৃতি ইম্প্রেশানিস্টদের কয়েকটি পোট্রেট দেখার সুযোগ হয়েছিল। ইম্প্রেশানিস্টদের জন্য আর একটি বিশাল মিউজিয়াম রয়েছে যার নাম ম্যুজে দ'র্সে।

৬.

রাতের আইফেল টাওয়ার যেনো আলোকমালায় সজ্জিত এক পরী। ১৮৮৯ সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে ইঞ্জিনিয়ার ও আর্কিটেক্ট গুস্তাফ ইফেল এই মনুমেন্টটি নির্মাণ করেন। এই টাওয়ারটির উচ্চতা ৩২৪ মিটার। তবে এর সৌন্দর্য্যের জন্যই হয়তো এই টাওয়ার এত জনপ্রিয়। সন্ধ্যা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত প্রতি ঘন্টায় একবার করে দশ মিনিটের জন্য পুরো টাওয়ারটি আলোয় ঝলমল করে উঠে। প্রতি বছর এখানে কনসার্ট, প্রদর্শনী ইত্যাদি অনেক ধরণের কর্মকান্ড হয়। দশ হাজার একশত টনের এই মনুমেন্টটি

নির্মাণের পর গত বছর পর্যন্ত মোট তেইশ কোটি চৌষট্টি লক্ষ পয়তাল্লিশ হাজার আটশত বারো জন দর্শক মনুমেন্টটি ভিজিট করেছে।
প্যারিসের সৌন্দর্য্যের সত্যি কোনো তুলনা হয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে এই নগরীকে রক্ষার সব ধরনের চেষ্টা হয়েছিল।
১৮ তারিখ সকালে পলাশের বাসা থেকে মেট্রোতে প্যারিস নর্ডএ পৌঁছালাম যথাসময়ে। প্যারিসের মেট্রো সম্ভবত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ। কোথাও কোথাও দোতলা মেট্রোও আছে। প্যারিস শহরে মোট ৩৫৬টি মেট্রো স্টেশন আছে। অন্ততঃ ৪০টি স্টেশনে দেখলাম বুদ্ধের ছবি। আলোচিত গিমে মিউজিয়ামে বাংলাদেশর যে প্রদর্শনী বাতিল হয়ে গেলো তার প্রচারের জন্য এসব ছবি লাগানো হয়েছিল।
আগের দিন পলাশের স্ত্রী চমৎকার বাঙ্গালী কায়দায় আতিথেয়তা করেছিল। আর আনওয়ার ভাইয়ের রান্নারতো কোনো তুলনাই হয়না। কথা সাহিত্যচর্চা কেন্দ্রের সভাপতি মোহাম্মদ জাকারিয়া রিপনের হোটেলে এক সন্ধ্যায় চমৎকার আড্ডা হয়েছিল। তিনদিনে প্যারিসের আসলে কিছুই দেখা হয়না। তবুও প্যারিস আমাকে মুগ্ধ করেছে। প্যারিসের মানুষ আরো মুগ্ধ করেছে। এরকম রুপসী শহর আমি আর দেখিনি।
৭.
লন্ডন ফিরে এলাম ১৮ তারিখ। আরো দুদিন লন্ডন কাটিয়ে ঢাকায় পৌছলাম ২১ জানুয়ারী। এই দু'দিন আসিফ এবং রত্না খালার সাথে অনেক ঘোরা হলো।
প্রতি বছর এ সময় দেশে আসার দুটো উদ্দেশ্য থাকে। এক মায়ের সাথে দেখা হবে এবং ফেব্রুয়ারীর বই মেলা উপভোগ করা। প্রবাসে যারা লেখালেখি করেন তাদের অনেকেই এই সময় দেশে যান। আমার জানামতে এ বছর কনাডা প্রবাসী অনেক লেখক দেশে গেছেন। তাদের বই প্রকাশিত হয়েছে। আমার নিজেরও অনন্যা থেকে দুটো বই প্রকাশিত হয়েছে। কনাডা প্রবাসীদের মধ্যে যারা এবছর দেশে গেছেন তাদের মধ্যে রয়েছে লুৎফর রহমান রিটন, যিনি এবার সাহিত্যে বিশেষ অবদান রাখার জন্য বাংলা একডেমী পুরষ্কার পেয়েছেন। এছাড়া কবি ইকবাল হাসান, সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল, লেখক সাদ কমালী, সালমা বানী প্রমূখ। সালমা বানীও একটি পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন। কবি রোকসানা লেইসের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।
এ বছর বাংলা একাডেমী বইমেলা অন্যান্য বছরের তুলনায় ছিল ব্যতিক্রম। এ বছর যেমন বই প্রকাশিত হয়েছে বেশী তেমনি বিক্রীও হয়েছে বেশী। ক্রেতা দর্শকের আগমনও ছিল বেশী। ঢাকা অনেক বদলে গেছে। মানুষগুলোও। মেয়েরা আরো। আমার পরিচিত মেয়েরাও।
এসাধিককাল থেকে যখন আসি তখন মা কেবল কাঁদে। বলে আমার আমার পাখী উড়ে যায়।

jasim.mallik@gmail.com
Toronto

DISNEYLAND PARIS

DISNEYLAND PARK